দ্বিতীয় বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা

জুন - অগাস্ট, ২০০৭

যুগ্ম সম্পাদক:
মনোজ রঞ্জন ঘোষ
নীলাংশু মুখার্জী

মুখ্য উপদেষ্টা : চিত্রেশ্বর সেন

সচিব : শান্তনু ঝা

অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ইন প্লান্ট প্রটেকসন (এএপিপি)
প্লান্ট প্রটেকস্‌ন ইউনিট, বি.সি.কে.ভি
মোহনপুর, নদীয়া ৭৪১২৫২

SASHYA SURAKSHA
Sept-Oct. Issue, 2006
Quaterly Bulletin of Association for Advancement in
Plant Protection(AAPP)
Plant protection Unit, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya
Mohanpur, Nadia, 741235
Published by SHANTANU JHA

সম্পাদক ঃ মনোজ রঞ্জন ঘোষ
নীলাংশু মুখার্জী

মুখ উপদেষ্টা ঃ চিত্রেশ্বর সেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ শঙ্কর ধর

প্রকাশক
শান্তনু ঝা, সচিব
এ্যাসোশিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ইন প্ল্যান্ট প্রোটেক্শন, প্লান্ট প্রোটেক্শন ইউনিট,
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মোহনপুর, নদীয়া, ৭৪১২৩৫

মুদ্রক
কৌশিক দত্ত, লেসার এইড প্রিন্টার্স, বি-৯/১০৭, কল্যাণী, নদীয়া, ৭৪১২৩৫
মোবাইল - ৯৩৩০৮৭৩৮০৮

পরিবেশক
এ.এ.পি.পি, প্লান্ট প্রোটেকশন ইউনিট, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর

দাম ঃ ১০ টাকা।

সম্পাদকমন্ডলী

যুগ্ম সম্পাদক — মনোজ রঞ্জন ঘোষ, নীলাংশু মুখার্জী
সচিব — শান্তনু ঝা
মুখ্য উপদেষ্টা — চিত্রেশ্বর সেন

সদস্য বৃন্দ — অমর কুমার সোমচৌধুরি, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতিকান্ত ঘোষ, শ্রীকান্ত দাস, পার্থসারথী নাথ, মতিয়ার রহমান খান, সুজিত কুমার রায়

সূচীপত্র

দু-চার কথা ঃ সম্পাদকীয়	১
সুরক্ষায় পরিচর্যা	২
সুরক্ষার অগ্রগতি	২
লাল সংকেত	৩
ফসলের শত্রু ঃ আক্রমণের লক্ষণ ও প্রতিবিধান	
ক) সুপারির রোগ	৩
খ) সুপারির কীট সমস্যা	
আম, কাজু, কমলালেবু, প্রভৃতি ফলগাছের কীট সমস্যা	৫
ফল বাগানের আগাছা	৭
আম, কাজু, কমলা লেবু ,কলা প্রভৃতি ফল গাছের রোগ সমস্যা	৯
বোরণ পুষ্টির কমবেশিতে ফসলের নানা ব্যাধি	১১
ফসলের ডাক্তারি	১২
রোগ-পোকার ঔষধ তৈরি করা	১২

দু-চার কথা

বহু ফসলের রোগ, পোকা ও কৃমি জনিত সমস্যা মাঠে, বাজারে এবং গুদামে বিপুল ক্ষতি করে। এদের দমনে দীর্ঘ একটা সময় ধরে রাসায়নিক রোগ, কীট ও কৃমি নাশকের উপর নির্ভর করে কৃষির অন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কীটশত্রুর পুনরাবির্ভাব, কীটনাশক সহনশীল কীটের সৃষ্টি, অগৌণ কীটশত্রুর প্রধান সমস্যা হয়ে ওঠা যেমন আছে তেমনই রোগসহনশীল ভ্যারাইটির জন্য নতুন মারাত্মক জীবাণু বর্ণের সৃষ্টি, রোগনাশক সহনশীল জীবাণুর সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠিত রোগনাশক ওষুধে কাজ না হওয়া ও আছে। সর্বপোরি পরিবেশ দুষণ তো আছেই।

জৈব, জীবাণুজাত ও উদ্ভিজ কীটনাশক, রোগনাশক প্রভৃতির আবিস্কার এবং প্রয়োগ এর মাঝেই একটা আশার আলো দেখিয়েছে। যদিও বিশেষ কয়েকটি রোগ পোকার ক্ষেত্রেই মাত্র এধরনের সুক্ষ উপকরণ তৈরির ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দেশে। এর মধ্যে প্যারাসিটয়েড ছোট্ট বোলতা ট্রাইকোগ্রাম্মা ধান, তুলো, আখ ও সবজির অনেক পোকার ডিম নষ্ট করে। করসিরা সেফালনিকার ওপর এদের সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে হেক্টরে ৭ টি ট্রাইকোকার্ড দিলে ১.৪ লাখ বোলতা মাঠে পৌছে যায়। প্রিডেটর ককসিনেলিডস বা লেডিবার্ড বিটল এর অসংখ্য প্রজাতি রয়েছে। এদের চাষ করার চেষ্টাও চলছে, তবে এখনও সফল হয়নি।

অনেকগুলি ছত্রাক ও চাষ করা হচ্ছে। যাদের ব্যবহার করে ফসলের অনেক কীটশত্রু দমন করা যায়। এরমধ্যে বিউভেরিয়া, মেটারহিজিয়াম বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে। বিটল লার্ভা, সাদামাছি, ক্যাটারপিলার দমন হয়। পেসিলোমইসিস কৃমি দমনের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। অনেক ফসলের ঢলা ও গোড়াপচা কমাতে ট্রাইকোডার্মা পাওয়া যাচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে সিউডোমোনাস ফ্লুরেসেন্স। পাওয়া যায় নিমভিত্তিক কীটশত্রু নিয়ন্ত্রক, নিম তেল, নিমবীজ গুঁড়ো এবং নিম খইল, মাটিবাহিত রোগজীবাণুর ও নিয়ন্ত্রক। সেক্স ফেরোমোন ব্যবহারও কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য এনেছে। ভারতে ৩০টি কীটশত্রু ক্ষেত্রে প্রযুক্তি জানা হয়েছে। পনেরটি বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এরাজ্যেও এসব প্রযুক্তি নিয়ে সফল গবেষণালব্ধ ফল রয়েছে। দরকার এসব উপকরণ উৎপাদনও বিপননের বাণিজ্যিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। উদ্যোগীও দরকার, উৎসাহ দেওয়াও দরকার। অনেকটা সময় কেটে গেছে।

নীলাংশু মুখার্জী
মনোজ রঞ্জন ঘোষ
সম্পাদক

সুরক্ষায় পরিচর্যা

পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল পাট। ব্যারাকপুরের ক্রিজাফের ২০০৪-০৫ র বার্ষিক প্রতিবেদনে শস্য সুরক্ষার যেসব সুপারিশ পাওয়া গেছে তার কয়েকটি যথেষ্ট কার্যকর।

পাটের প্রধান রোগসমস্যা **ডাঁটাপচার** (মাক্রোফোমিনা ফাসিওলিনা) জন্য জৈব রোগনাশক হিসাবে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ও অ্যাজটোব্যক্টরের মিশ্র প্রয়োগ করলে রোগ কমে যায়। সঙ্গে অন্য ব্যবস্থাগুলির মধ্যে পাতলা করে বীজ বোনা এবং আগাছামুক্ত চাষও জরুরি। বীজবোনার লাইনের দুরত্ব ক্যাপসুলারিসে (তিতা পাট) ৩৫ সে. মি. এবং অলিটোরিয়াসে (মিঠা পাঠ) ২৫ সে.মি. হবে। হেক্টরে জৈবসার ৭-৮ টন, পটাশ সার ৫০-১০০ কেজি এবং অণুখাদ্য সার-দস্তা, লোহা এবং বোরণ প্রয়োগ করলে রোগের প্রকোপ অনেক কমে যাবে। বীজবোনার আগে বীজশোধনতো আছেই।

পাটের কৃমিজনিত (মেলয়ডোগাইন ইনকগনিটা ও মে. জাভানিকা) **শিকড় ফোলা** রোগ কমাতে প্রথমত সহনশীল ভ্যারাইটি জে আর ও ৫২৪ এবং জে আর ও ৬৩২ চাষ করতে বলা হয়েছে। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে করঞ্জ, মহুয়া, বাদাম প্রভৃতির খোল বা করাত গুঁড়ো বা গোবরসার প্রয়োগের সুপারিশ আছে। ফসলের নাড়া, অবশেষ এবং আগাছা পরিস্কার করে, পাটের অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলে ২ বছর ধান বা গমের সঙ্গে ফসলচক্রে চাষটা করা দরকার। এসব ব্যবস্থায় কৃমির প্রকোপ কমবে।

পাটের আগাছা হাতে নিড়োতে অনেক খরচ। চাষের মোট খরচের ৩৫-৪০ শতাংশ। তাই পাটে অঙ্গুরোদমপূর্ব আগাছানাশক দিয়ে খরচ কমানোর চেষ্টা হয়েছে। বীজবোনার ৪ সপ্তাহ পরে হেক্টরে ০.৭৫ - ১.০ কেজি এ. আই হিসাবে ডাইনাইট্রোঅ্যানিলিন ওষুধ মাঠে প্রয়োগ করে মাঠ আগাছামুক্ত করা গেছে। তবে পাটের ক্ষেতের ঘাস জাতীয় ও চওড়াপাতা আগাছা ভালোই দমন করা গেছে বীজবোনার আগে মাটিতে ০.৭৫-১.০ কেজি এ. আই হিসাবে ডাইনাইট্রোঅ্যানিলিন প্রয়োগ করে। দেখা গেছে এতে পাটতন্তুর উৎপাদন ও বেড়েছে।

সুরক্ষায় অগ্রগতি

শস্য সুরক্ষায় অগ্রগতি ঘটছে নানা পথে। নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে।

- আসামে ধানের কীটশত্রুর আক্রমণে যতটা ক্ষতি হয় তার ৩৫-৬০ শতাংশই হয় **পামরি পোকা** (ডিক্লেডিসপা আর্মিজেরা)র আক্রমণে। ব্যাপক আক্রমণ ঘটলে কীটনাশক স্প্রে করেও কাজ হয় না। পামরি পোকার সমস্যা পূর্বভারতে যথেষ্ট। এই পোকার একটি প্রাকৃতিক শত্রু আছে। একটি ছত্রাক, নাম বিউভেরিয়া বাসিয়ানা। এই ছত্রাকটি পামরি পোকার ভ্রুণ, ভ্রুণ-পরবর্তী সব অবস্থায়ই আক্রমণ করে। ডিম লার্ভা এবং পিউপার উপরে এই ছত্রাক বৃদ্ধি পায় এবং সাদা করে ঢেকে ফেলে। ধাড়ির উপরও মারাত্মক আক্রমণ ঘটে। এই ছত্রাকটি পামরি পোকার জৈব নিয়ন্ত্রণেও ব্যবহার হচ্ছে আজকাল। ছত্রাকটির চাষ করে পরিমান বাড়ানো হয় ধানের তুঁষ কুঁড়ো আর করাত গুঁড়োর সাথে ২ শতাংশ হারে ডেক্সট্রোস এবং কাইটিন মিশিয়ে তাতে চাষ করে। এই জৈব কীটনাশক শুধুমাত্র এবং অর্ধেক হারে ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে প্রয়োগ করে পামরিপোকা নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। এটা উৎপাদন করতে উদ্যোগীরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ করুন।

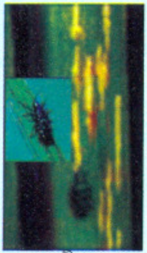

পামরী পোকা
আক্রান্ত পাতা

সূত্র - কে. সি. পুজারি ও সহকর্মী, ২০০৭, এ.পি.পি. সেমিনার।

● আলুর **ব্যক্টিরিয়া** (রালস্টনিয়া সোলানেসিয়েরাম) জনিত **ঢলে পড়া** রোগ ফসলের বিরাট ক্ষতি করছে। এ রাজ্যের লাল ও কাঁকুরে মাটি অঞ্চলেও এরোগের প্রকোপ বেশি। রোগটি নিয়ে দীর্ঘকাল বহু গবেষণা হয়েছে - দেশে এবং বিদেশে। সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায় নি। শ্রীনিকেতনে একটি সুপরিকল্পিত গবেষণাতে সমাধান পাওয়া গেছে। দোয়াঁশ-বালি মাটিতে, মাধ্যমিক উর্বরতা এবং অম্ল মাটি (পি.এইচ - ৫.৬২)তে পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। আস্ত আলুবীজ নিয়ে, কার্বেন্ডাজিম ও স্ট্রেপটোসাইক্লিন দিয়ে বীজ শোধন করে, মাটিতে ভালোকরে পচানো গোবর সার দিয়ে বীজ বসানো হল। পরে সারির দুপাশে মাটি তোলার সময় গোবর সার দিয়ে, এবং ব্লিচিং পাউডার জলে ভিজিয়ে সুফল পাওয়া গেছে। অন্য সার হিসাবে গোবর খইল, সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং মুরিয়েট অব পটাশ ২০ ।৫ ।৩ ঃ ১ হারে প্রয়োগ করা হল। এই ব্যবস্থাতে আলুচাষ করে ভালো ফলন পাওয়া গেছে এবং ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে আলু চাষ করে প্রতি একটাকা খরচে সর্বাধিক লাভ হয়েছে।

সূত্র ঃ ড. পার্থ ঘোষ ও এন.সি.মন্ডল, শ্রী নিকেতন

লাল সংকেত

পূর্ব হিমালয়ের স্বাভাবিক ফসল বড় এলাচ। দার্জিলিং, সিকিম, নেপালে এর চাষ। বড় এলাচের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ইদানীং এলাচের যত ফুল ধরছে তার ৭০শতাংশই বন্ধ্যা থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরাগমিলনের অভাবে। পরাগমিলনটা হচ্ছে না কেন? এর পরাগমিলন সাধারণ মৌমাছি করতে পারে না। বড় ভোমরা করতে পারে। কারণ বড় এলাচের ফুলের পাপড়িগুলি মিলে ডিম্বকোষের (ওভারি) চারদিক ঘিরে মধুনল তৈরি হয়। সাধারণ মৌমাছির মাপে ছোট শুঁড় পুং ও গর্ভকেশরের তলায় মধু পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাই শুধু ফুলের রেণু নিয়ে যায়। রেণু চোর মৌমাছির কারণে রেণুর পরাগ মিলনের পরিমান ততধিক কমে যায়।

ফুলের পরাগমিলনকারী পোকা ভোমরার (বামবল বি) বড় শুঁড় দিয়ে পরাগমিলন করানোর সম্ভাবনাও কমে যায়। বড় ভোমরা জঙ্গলের বড়গাছে চাক বাঁধে। গাছ কেটে পরিবেশের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়েছে। চাক বাঁধার জায়গা ও পরিবেশ নেই। তাই ভোমরার সংখ্যা ও কমে গেছে। মৌমাছির মত ভোমরার কৃত্রিম চাক ও করা যায় না। বড় এলাচের রোগপোকার সাথে পরাগমিলন সমস্যা হাত মিলিয়ে অর্থকরী এ ফসলের ফলন মারাত্মক ভাবে কমিয়েছে।

সূত্র ঃ- দ্য টেলিগ্রাফ, নো হাউ, সেপ্টেম্বর ১০,২০০৭

ফসলের শত্রুঃ আক্রমণের লক্ষণ ও প্রতিবিধান

ক) সুপারি ঃ এ ফসলটি চাষই হয় বেশি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে। যে সব রোগে আক্রান্ত হয় তারমধ্যে কোলে বা মাহালি রোগ, কান্ডে ক্ষত রোগ এবং পাতায় ডোরাদাগ।

● **মাহালিরোগ -** প্রথমে ফলে আক্রমণ করে ফাইটফথোরা। সবুজ ফলের রঙ গাঢ় সবুজ হয়। পরে ফলের খোলাটা পচতে শুরু হলে হালকা হলুদ ও বিবর্ণ হয়। এরকম ফলের গায়ে সাদা ছত্রাকের আস্তরণ দেখা যায়। তারপর ফল ঝরে পড়ে। পরে পাতা এবং কাঁদি - সবই গোড়ার দিক থেকে পচতে থাকে। শুকিয়ে যায়। বর্ষায় গাছ আন্দোলিত হয় ঝড়ে। সে সময় রোগ একগাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায়। গাছের গায়ে ছত্রাকসূত্র হয়। জীবাণু বেঁচে থেকে যায় বর্ষার পরে। মাটিতেও ছত্রাকের ক্লামাইডোস্পোর হিসাবে বেঁচে থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে চাষ করা, আক্রান্ত গাছ নষ্ট করে ফেলা, ঝরে পড়া ফল জড় করে পুড়িয়ে ফেলা দরকার। অল্পস্বল্পরোগ দেখা

দিলে গাছে স্প্রে করা গেলে ভালো। বছরে দুবার মে এবং অক্টোবর মাসে তামাঘটিত ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

● **পাতায় ডোরাদাগঃ** রোগটি ব্যাক্টিরিয়াজনিত। পাতায় শিরার সমান্তরাল লম্বা লম্বা, লাইনে সাজানো জলে ভেজা দাগ হয়। দাগগুলো পরে খড়ের রঙের হয়। সেখান থেকে আঠাল পদার্থ বেরিয়ে পাতার উপরে চটচটে আস্তরণ পড়ে। পাতার ঐ সব অংশ ঝলসে শুকিয়ে যায়। ছোট বা চারাগাছের মাথাটা ঝলসে গাছ মরে যেতে পারে।খুব বেশি হয় না।

● **পাতায় ও কান্ডে ক্ষত ঃ** রোগ খুবই দেখা যায়। পাতায় শিরামধ্যবর্তী ফলকে লম্বাটে ঝলসানো দাগ হয় যার মাঝে একটা লালচে রঙ থাকে। কান্ডে প্রথমে ছোটছোট লাল বিন্দুর মত ক্ষত দাগ হয়। পরে ক্ষত ছড়িয়ে গিয়ে ঐ দাগগুলিজুড়ে অনেকটা এলাকা নিয়ে ক্ষত গভীর হয়। তখন ভিতরের কলা ছিবড়া ছিবড়া শুকনো ধূসর রঙ ধারন করে। এ ধরনের ক্ষত উপরে নীচে ছড়ায় বেশি। কান্ড ঐ স্থানে দুর্বল হয় এবং গাছ ভেঙ্গেও পড়তে পারে। এসবক্ষেত্রে কান্ডের ক্ষত স্থানে প্রথম অবস্থাতেই তামাঘটিত ঔষধের প্রলেপ (কপার অক্সিক্লোরাইড ও তিসির তেল) লাগানো যায়।

সুপারি গাছের কীট শত্রু ঃ

সুপারি গাছে সামান্য কীটশত্রু আক্রমণ ঘটে। কদাচিৎ মারাত্মক হয়।

মাঝপাতার শোষক পোকা - লাল ও কালো রং এর ছোট পূর্ণাঙ্গ ও মোটামুটি একই রং এর শাবক নিম গাছের মাঝ ও অর্ধেক খোলা কচি পাতায় ঝাঁক বেঁধে রস শুষে খায়। ফলে শোষণ করা জায়গাটিতে লম্বাটে বাদামি দাগ হয়। পরে শুকিয়ে খসে পড়ে। আক্রমণ হলে শোষকজনিত ক্ষতগুলি মিলে গিয়ে পাতা ছেঁড়া খোঁড়া দেখায়। গাছের বাড় কমে।

পোকাগুলি পাতার গোড়ায় কান্ডের সঙ্গে লেগে থাকা আলগা জায়গায় দল বেঁধে থাকে। নির্ধারিত মাত্রায় যে কোনও কীট নাশক মাঝ পাতায় ও পাতার গোড়ার দিকে স্প্রে করতে হয়।

● **আঁশ পোকা** - বেশ কয়েকটি প্রজাতির আঁশ পোকা পাতায় লাগে। অধিকাংশই বেশ কাছাকাছি পাতার সঙ্গে মাছের আঁশের মতো লেগে থাকে। এক জায়গা থেকেই সারা জীবন রস শোষণ করে। প্রজাতি হিসাবে মাপ, আকারও রং আলাদা হয়। প্রায় গোলাকার তিন চার মি মি. মাছের আঁশের মতো মাথার দিকটা একটু চওড়া এবং পিছনের দিকে ক্রমে সরু হালকা বাদামি বা সাদাটে দু-তিন মি.মি. লম্বা আঁশ পাশাপাশি পাতার নিচের দিকেই থাকে। অথবা পাতার মাঝে মাঝে সোলার টুপির মত পাতায় চার-পাঁচ সে মি. সাদাটে রংয়ের আঁশ পোকা মাঝে মাঝে দেখা যায়। পাতার যেখানে লেগে থেকে এরা রস শুষে নেয় এর উলটো দিকটা হলুদ বিবর্ণ হয়ে যায়।

আগের পোকাটির মতোই ওষুধ প্রয়োগে বা হাতদিয়ে পোকার ঝাঁক বা পোকাগুলিকে চেপে ঘসে দিয়ে মেরে ফেলা যায়।

বেশ কয়েকটি **মাকড়** শত্রু পাতার নীচে শিরা বরাবর বা পুরো পাতায় প্রচুর সংখ্যায় রস শোষণ করে। পাতা বিবর্ণ করে দেয়। পাতা তামাটে হয়ে শুকিয়েও যায়। খুবই ছোট মাকড়, প্রায় চোখেই পড়ে না। লালা মাকড় পিনের মাথার মতো লালচে বিন্দু খুব লক্ষ্য করলে দেখা যায়। সালফেক্স লিটারে তিন গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে বা অন্য মাকড়নাশক ব্যবহার করে দমন করা যায়। পাতার তলার দিকেই স্প্রে করতে হবে। পাতার তলদেশেই বেশি থাকে।

কুটীর শিল্প জাত পণ্য। নিমতেল সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। তাতে ফসলের ক্ষতি হয় এবং

যন্ত্রের সাহায্যে তেল স্প্রে করা যায় না। নিমতেল স্প্রে করতে হলে এক লিটার জলে পাঁচ গ্রাম বা এক চামচ গুঁড়ো সাবান ভালকরে গুলে নিয়ে সেই গোলা জলে আড়াই থেকে পাঁচ মিলি নিম তেল দিয়ে বেশ ভালভাবে কাঠিদিয়ে নাড়লে সাদাটে ঘোলা মিশ্রণ পাওয়া যাবে এবং তা ফসলে স্প্রে করে কীটশত্রু দমন করা যায়। তবে বেশ কিছু গাছে এই ধরনের মিশ্রণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। যেমন বাঁধাকপি মুগ-কলাই ইত্যাদির পাতায় পোড়া বা ঝলসানো হয়ে যায়। তাই পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া উচিত। মাটিতে থাকা কীট শত্রু যেমন লাল পিঁপড়ে (আলুর গুটি ছেঁদা করে দেয়। কাটুই পোকা (Cutworms), উই পোকা, উচচিংড়ে (Cricket), সুরসুরে পোকা (mole cricket) ইত্যাদির প্রকোপ কমানো যায় একর প্রতি কুড়ি কে জি হারে নিম খোল দিয়ে। মাটি তৈরি করে প্রয়োগ করা হয়।

খ) আম, কাজু, কমলালেবু কলা প্রভৃতি ফলগাছের কীট সমস্যা

- **কান্ড ছিদ্রকারি পোকা ঃ**

দীর্ঘজীবী বৃক্ষে (আম, কাজু বাদাম, সজনে, কমলালেবু ইত্যাদি) গুবরে পোকা, কোলিঅপটেরাবর্গেই লম্বা শুঁড় গুবরে পোকা গোষ্ঠীর কয়েকটি কান্ড ছিদ্রকারি পোকার প্রজাতি একাধিক ফলের গাছের ক্ষতি করে। যেমন - আমে ব্যাটোসেরা, কাজুবাদাম গাছে প্লসিডোরাস, দার্জিলিং এ কমলালেবু গাছে অ্যানোপ্লোফোরা ইত্যাদি। এই পোকাগুলির ধাড়ি আড়াই সে. মি লম্বা. প্রথম জোড়া শক্ত ধূসর ডানা দিয়ে ঢাকা পিঠ। মাথা থেকে লম্বা এক জোড়া শুঁড় থাকে। ডানায় কয়েক ক্ষেত্রে কালো ফোঁটা থাকে (আমের পোকা)। বৈশাখের শেষ থেকে পোকাগুলি পুরো বর্ষা ধরে সন্ধ্যায় বিজলি বাতির আলোতে উড়ে আসে। এই সময় গাছের কান্ডে বা মোটা ডালের বাকলে গর্ত করে বা কোনও কাটা জায়গাতে এক বা একাধিক ডিম পেড়ে দেয়। সাতদিনে ডিম ফুটে বাদামি মাথা দিয়ে ঘি রংঙের কীড়া বেরিয়ে প্রথমে বাকলের নীচে আঁকাবাঁকা ভাবে সুড়ঙ্গ করে। পরে গুঁড়ি বা মোটা ডালের ভিতরের শক্ত কাঠ খায় ও বড় সুড়ঙ্গ করে। গোড়ার দিকেই নামতে থাকে। শীতের আগেই অধিকাংশ কীড়া বেড়ে প্রায় পাঁচ সেমি হয়ে যায়। সুড়ঙ্গ থেকে বাকলের দিকে ধাড়ি বের হবার আড়াআড়ি ছিদ্র বানায়। কান্ডের ভিতরের সুড়ংঙ্গে ফিরে কাঠের গুঁড়োর গদিঘর বানায় ও পুত্তলি হয়ে যায়। সারা শীত ও বসন্ত এইভাবে কাটে। গরম পড়লে পুর্ণাঙ্গ হয়ে পুত্তলি ঘরে অপেক্ষা করে। বৃষ্টি পড়লে বাহিরে এসে আবার অক্ষত গাছে বা ডালে ডিম পাড়ে। কাজেই এই পোকা একটি জীবনচক্র পূর্ণ হতে এক বছর লাগে।

কাজু বাদামের কান্ড ছিদ্রকারি পোকা

এই পোকার আক্রমণে গাছ বা গাছের ডাল শুকিয়ে মরে যায়। আক্রান্ত ক্ষতে জীবাণু বা ছত্রাক আক্রমণ হয়। ক্ষতস্থানে পচন ধরে। গাছ বা ডাল নিজে বা সামান্য বাতাঁসে ভেঙ্গে যায়। গাছের বাড় কমে। গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। গৃহীত ও উৎপন্ন পুষ্টি গাছের নানা অংশে যেতেপারে না। ফলন খুব কমে যায়।

গুঁড়ির কাটা অংশে বাকলের ক্ষতে বা মোটা ডাল কাটা হলে সেখাঁনে কীটনাশক মেশানো চটচটে (মলম) লেগে ঢেকে দিতে হবে। বাকলের শুকনো শক্ত অংশ নরম বাকল দেখা পর্যন্ত চেঁছে

তুলো মনোক্রোটোফসে ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে বেঁধে দিয়ে পাতলা পলিথিনের কাগজ দিয়ে ঢাকতে হবে এতে ভিতরের কীড়া মারা যাবে।

- **বাকল খাওয়া লেদা পোকা বা ইনডারটেল্লা।**

এটিও প্রায় সব বৃক্ষের ডালের বাকল খায়। পোকাটি অবশ্য লেপিডপটেরা মথের কীড়া। এক ইঞ্চি মাপের হলদে ধূসর মথগুলি সন্ধ্যারপর গুঁড়ির সংঙ্গে ডালের সংযোগ স্থলে ছোট সাদা গোল ডিম পেড়ে দেয়। গ্রীষ্মকালেই আক্রমণ বেশি। তিন-চার দিনে ডিম থেকে ছোট বাদামি ধূসর কীড়া বাকলের শুকনো এবং নরম অংশ স্থানে স্থানে খেতে থাকে। পনের বিশ দিনে পুত্তলি হয়। বেশির ভাগ সময়ে ডালে ও গুঁড়িতে বা দুটি ডালের জোড়ে আড়াআড়ি গর্ত করে তাতে বা লালাসুড়ঙ্গে লুকায়। পুত্তলি থেকে ধাড়ি মথ সাত দশ দিনে হয়ে যায়। আবার বংশবিস্তার করে।

ডিম থেকে বেরিয়ে কীড়া শক্ত বাকলের গুঁড়ো মল ও লালা দিয়ে বাদামি চেরা নলের মতো ফাঁপা দুপাশ বাকলে জুড়ে দিয়ে ভিতরে লুকিয়ে খেতে খেতে এগোয় নতুন বাকলের দিকে। তৈরী হয় সুড়ঙ্গ পথ গাছের বাকলে বাদামি মালার মতো লেগে থাকে। নরম বাকলে আঁকা বাঁকা খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝাঁকেঝাঁকে এরকম লুকিয়ে কুরে খায়। সুড়ঙ্গ পথ ছিড়ে গেলে বাকলে চেঁছে খাওয়া ক্ষত দেখা যায়। সরাসরি তেমন ক্ষতি নেই। তবে জীবাণু বা ছত্রাক আক্রমণের সুবিধা করে দেয়। দিনের বেলায় বা অল্প বাধাতে কীড়া তাড়াতাড়ি গর্তে আশ্রয় নেয়। ফলে সুড়ঙ্গ হলেও কীড়া দেখা যায় না।

এই কীট দমনের জন্য কোন কীটনাশক ব্যাপক প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। চটের থলের টুকরো দিয়ে ঘসে কীড়ার আশ্রয় গর্ত খুঁচিয়ে কীড়াকে মেরে ফেলা যায়। কুরে খাওয়া ক্ষততে ছত্রাকনাশক লাগাতে হবে।

- **পাতায় বাসা করা কীড়া (ম্যাকাল্লা বা অর্থাগা)**

আম ও কাজুবাদাম বাগানে কীট শত্রুটি তেমন মারাত্মক ক্ষতি করে না। মথের কীড়াগুলি একসঙ্গে ছোট ছোট শাখার বড় পাতাগুলি লালা দিয়ে জুড়ে বড় বাসা বানায়। একটি গাছে কয়েকটি এমন বাসা দেখা যায়। কখনও কখনও তা সারা গাছেই। কীড়া বাসার ভিতরে পাতার ভিতরের পিঠের সবুজকণিকা যুক্ত কোষ কুরে খেয়ে নেয়। বাসার পাতাগুলি ঝাঁঝরা হয়। পরে শুকিয়ে যায়। লালাজালে আটকানো কীড়ার বাদামি শুকনো মলের গুঁড়ো যুক্ত পাতার বাসা দেখা যায়। এই কীড়ার আক্রমণ বসন্তকালের পর থেকে বর্ষার শুরু পর্যন্ত। ব্যাপক আক্রান্ত মাঝারি বয়সি গাছের ফলন কমে।

কীড়ার মথ মাঝারি মাপের ও কালচে ধুসর। মথ সন্ধ্যার পর সক্রিয় হয়। ওড়া -উড়ি করে ও পাতায় একটি একটি করে কটা ডিম পেড়ে দেয়। কালচে বাদামি মাথা ধূসর সাদা কীড়াগুলি প্রথমে পাতার শিরা বাদ দিয়ে সবুজকোষ কুরে খায়। বড় হয়ে কাছাকাছি পাতাগুলিই লালাজালে জড়িয়ে বাসা করে। পাতা খেয়ে বড় হয় ও বাসা বড় করে। বাসার পুরানো অংশটি কাছাকাছি নতুন পাতা জুড়ে বাসা বড় করে। প্রায় ১৫-২১ দিনে কীড়া বাসার ভিতরেই বাদামি রঙের পুত্তলি হয়। পুত্তলি থেকে পুর্ণাঙ্গ মথ বেরতে লাগে ১০-১২ দিন। মথ আবার ডিম পাড়ে। আক্রমণ খুব বেশি হলে আক্রান্ত শাখাগুলি কীড়া ও পুত্তলিসহ ছেটে পুড়িয়ে ফেলা চাই। সাধারণভাবে আমের কীটনাশক শ্যামাপোকা বা ম্যাঙ্গো হপারের মত দিতে হবে।

ফল বাগানের আগাছা নিয়ন্ত্রণ

ফলের বাগানে দুটি গাছের মধ্যে যেহেতু ফাঁক বা দুরত্ব বেশি থাকে তাই আগাছার উপদ্রব বেশি। আগাছার সমস্যা আরও বেশি হয় প্রাথমিক কয়েক বছর। কয়েক বছর পর ফলগাছগুলি বড় হয়ে গেলে সমস্যা কম হয়, গাছগুলি বড় হলে আগাছা তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না, ফল গাছের ছায়াতে কিছু আগাছা ঠিক মত জন্মাতে পারে না, তবে আগাছার উপদ্রব সবসময়ই থাকে এবং তারা মাটি থেকে কিছু পরিমাণ রস বা উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান টেনে নিয়ে ফলগাছের ক্ষতি করে। এছাড়া আরও একটা সমস্যা হয়, তা হল, এরা রোগের জীবাণু বা পোকা-মাকড় দের আশ্রয় দেয় বা এদের বিকল্প পোষক হিসাবে কাজ করে।

ফল-বাগানে ঘাস জাতীয় আগাছা ছাড়াও বেশ কিছু বড় পাতার আগাছা দেখা যায়, যেমন - বনটেপারি, কাঁটানটে, দুধিয়া, বনবেগুন, ভার্নোনিয়া (ঝুরঝুরি), লেনটেনা(ভূত ভৈরবী), পার্থেনিয়াম, কাসকুটা (সোনালি), কাসিয়া, লউনিয়া, হাতিশুঁড়, মাইকেনিয়া (তারালতা), কিউকিমিস, ইত্যাদি।

ফল-বাগানে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা হল -

১) গাছগুলির মাঝের ফাঁকা জায়গা চাষ দিয়ে রাখতে হবে। চাষ দিয়ে মুগ, কলাই, বরবটি, সয়াবীন, বাদাম, মটরশুটি, ইত্যাদি শিম্বিজাতীয় বা ডাল ফসল বুনে দিতে হবে। এই ধরনের ফসল আগাছার উপদ্রব কমাবে, মাটির স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা ভাল রাখবে, এবং ফল গাছের সাথে খুব বেশি প্রতিযোগিতায় যাবে না।

২) বছরের বিভিন্ন সময়ে , মাঝে-মধ্যে অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে, ফল গাছের গোড়ার চারপাশে বৃত্তাকারে মাটি খুঁড়ে (রিং-এর মত) আগাছা তুলে ফেলতে হবে। প্রথম দিকে ফলগাছ যখন ছোট থাকবে নিড়ানি বা খুরপি ব্যবহার করতে হবে, যাতে শিকড়ের ক্ষতি না হয়। পরবর্তী কালে (গাছ বড় হয়ে গেলে) কোদাল দিয়ে এ কাজ করা যাবে।

৩) ফল গাছের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় (পুরানো বাগানে অর্থাৎ গাছ বড় হয়ে গেলে) হালকা চাষ দিয়ে লংকা, আদা, হলুদ ইত্যাদির চাষ করতে হবে, এতে আগাছার উপদ্রব কম হবে। সাথী ফসলের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছায়াতে সব ফসল ভাল হয় না। মাঝের ফাঁকা জায়গায় সাথী আগাছার উপদ্রব কমায়। সাথী ফসল থেকে উচ্চ ফলন বা আয় আশা না করে ডাল জাতীয় ফসল লাগানো উচিত। এছাড়া গাঁদা ফুল, তুলসী বা অন্যান্য ভেষজ লাগানো যায়। পরিচর্যার অভাবে বা অন্য কারণে আগাছা ঘন বা বেশি বড় হয়ে গেলে তা জমি ঘেঁষে বা মাটির তল বরাবর কেটে জমিতেই ফেলে রাখা ভাল। এর ফলে মাটিতে কিছু জৈব পদার্থ যোগ হয়, আর কেটে ফেলে রাখা আগাছাগুলি আচ্ছাদনের কাজ করে। আগাছা কাটার কাজ ফল বা বীজ ধরার আগেই করতে হবে। কারণ সেই বীজ থেকে নতুন আগাছা জন্মাবে।

৫) খুব গরমে গাছের সারির মধ্যে ফাঁকা জায়গায় পলিথিনের চাদর দিয়ে মাটি ঢেকে রাখতে হবে। আগাছার উপদ্রব কম হবে। বিভিন্ন রঙের পলিথিনের চাদর বা চট এর মধ্যে স্বচ্ছ পলিথিনের সিট বা কালো পলিথিনের চাদর বেশি কার্যকরী। জমির ওপর খড় , কাগজ, কাটের গুঁড়ো, বস্তা, প্রভৃতি বিছিয়ে জমি ঢেকে রাখা যায়। ঢেকে রাখলে আগাছা কম হবে। সাধারণতঃ এক এক বারে টানা ৩০-৪৫ দিন ঢেকে রাখা হয়।

৬) আগাছার উপদ্রব বেশি হলে, আগাছানাশক দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে। আগাছানাশক সাবধানে নিতে হবে, যাতে ওষুধ গাছের পাতায়, গাছের গায়ে না লাগে। হুড লাগানো বা ঢাকনা দেওয়া স্প্রেয়ার দিয়ে ওষুধ দেওয়া উচিত। ফলের বাগানে বহু ধরনের আগাছা মিশে থাকে তাই সর্বনাশা আগাছানাশক যা আগাছা বাছ বিচার না করে মারে তা প্রয়োগ করতে হয়। ওষুধ বাছার জন্য কৃষি -বিশেষজ্ঞ বা আগাছা বিষয়ে দক্ষ বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

৭) বিদেশে ক্ষুদ্র শব্দতরঙ্গ দিয়ে আগাছা দমন করা হয়। এই পদ্ধতি এক উন্নত ও কার্য্যকর পদ্ধতি। এতে পরিবেশ দুষণ কম হয় বা একেবারেই হয় না। কিন্তু এই পদ্ধতি বেশি পরীক্ষিত নয়। ফলে মাটিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র প্রাণী বা উপকারী জীবাণু মারা যায় কিনা জানা হয়নি। তবে সহজেই শব্দ তরঙ্গ দিয়ে আগাছা দমন করো সম্ভব। ভবিষ্যতে হয়ত এই পদ্ধতির প্রচলন বাড়বে।

সূত্র. ড. কাজল সেনগুপ্ত, বিসিকেভি।

আম, কমলালেবু, কাজুবাদাম এর আঠাঝরা রোগ ঃ

রোগটি বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক আক্রমণে দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় গাছের কান্ড এবং শাখা প্রশাখার ছাল দিয়ে রস গড়াতে থাকে, পরে ছালগুলি ফেটে বাদামি রঙের হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। অনেক সময় কান্ড ও ডালপালার কাঠ বেরিয়ে পড়ে। রোগের মাত্রা বেশি হলে কান্ডও ডালের সমস্ত ছাল শুকিয়ে যায়, পাতা ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। অবশেষে সমস্ত গাছটি শুকিয়ে যায়।

লেবুর আঠা ঝরা রোগ

বর্ষায় এই রোগের আক্রমণ হলেও বৃষ্টিতে আঠা ধুয়ে যায় বলে রোগের লক্ষণটি খুব বেশি বোঝা যায় না। বর্ষার পরবর্ত্তী সময়ে এ রোগের লক্ষণগুলি বেশি মাত্রায় চোখে পড়ে। জমির নিকাশি ব্যবস্থা ভাল না হলে, ভুগর্ভস্থ জলস্তরের মাত্রা বেশি থাকলে, বাগিচার মাটির তাপমান ২৪-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এবং গাছের যথাযথ পুষ্টির অভাবে এ রোগের মাত্রা বাড়ে।

রোগ কমাতে আক্রান্ত ডালপালার নীচের ৩-৪ ইঞ্চি সজীব অংশ সহ ছেঁটে ফেলতে হবে। মোটা কান্ড হলে ধারালো ছুরি দিয়ে পচা আঠাঝরা অংশ (কিছুটা সজীব অংশ সহ) চেঁছে বাদ দিতে হবে। তিসির তেলে কপার অক্সিক্লোরাইড (যেমন ব্লাইটক্স ৫০ শতাংশ পাউডার) বা অন্য কোন উপযুক্ত ছত্রাকনাশক এর পাতলা মলম বানিয়ে কাটা বা চাঁছা অংশে প্রলেপ দিতে হবে। গাছের মূল কান্ডে আঠা ঝরার মাত্রা বেশি হলে মাটি থেকে ৫০-৭৫ সেন্টিমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বছরে অন্তত একবার উপরোক্ত ছত্রাকনাশকের প্রলেপ দিতে হবে। গাছের উপরের ডালপালায় আঠাঝরা দেখা গেলে উল্লেখিত ছত্রাকনাশক টি ৩-৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

যে সমস্ত এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর বেশি, নিকাশি ব্যবস্থা দুর্বল, সেখানে গাছ বসানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে চারার কান্ডের অংশটি জমির সমতল থেকে বেশীমাত্রায় উপরের দিকে থাকে। আক্রান্ত বাগিচায় নিয়ন্ত্রিত সেচ দিতে হবে। গাছের অতিরিক্ত ডালপালা ছেঁটে রোদ ও হাওয়া ঢোকার ব্যবস্থা চাই। গাছে পুষ্টির জোগানটা নিয়মিত ও সঠিক মাত্রায় দিতে হবে। কমলালেবুর গোড়ায় আঠা ঝরা কমাতে মেটালাক্সিল-মানকোজেব অথবা ফসিটাইল এ ওষুধ গোলা জল গাছের গোড়ায় ১-২ বার ভিজিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

তথ্য ঃ সুজিত কুমার রায় ও সুব্রত দত্ত, বি.সি.কে.ভি.

আম, কাজু, কমলা ও কলার ক্ষত রোগ

ছত্রাক জনিত রোগটি আম, কাজু, কমলা, কলা ইত্যাদি ফলগাছ ছাড়াও অন্যান্য অনেক গাছে দেখা যায়। বিভিন্ন গাছে রোগের লক্ষণগুলির কিছুটা প্রকার ভেদ হয়। ফাল্গুন মাসে আমের মুকুল বেরোনোর সময় যদি ১-২ বার ঘন কুয়াশা বা হঠাৎ বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে মুকুলগুলি কালো হয়ে ঝলসে যায়। ফুল ফোটার সময় ছত্রাকের আক্রমণে ফুল ও মঞ্জরিদন্ডের উপর কালোয় বাদামি দাগ পড়ে, পরে ফুলগুলি ঝরে পড়ে। আমের গুটি ধরার সময় আক্রমণ হলে গুটির উপর এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাড়ন্ত (মার্বেল আকৃতির) ফলে কালোয় বাদামি অবতলযুক্ত ক্ষত দাগ হয়। আক্রান্ত গুটিগুলি ঝরে পড়ে। কমলা, কাজুবাদাম গাছে ফুল ও ফলে আমের মতই গাঢ় বাদামি বা কালো ক্ষত দাগের লক্ষণ দেখা যায়। বর্ষাকালে এই রোগটির জন্য আম, কমলা, কাজু গাছের ডগা ঝলসা ও ডগার ডাল শুকিয়ে যায়। আবার কলাতে এই রোগের আক্রমণ মুলত বাজারে বা বাড়িতে পাকা ফলে দেখা যায়। ফলের উপর কালো ক্ষত দাগ হয়, মাত্রা বেশি হলে পুরো কাঁদির ফলগুলি কালো হয়ে যায় ও পুরো কুঁচকে যায়। এ রোগ কমাতে কতকগুলি সুপারিশ এখানে দেওয়া হলঃ

লেবুর ক্ষত রোগ

কলার ক্ষত রোগ

আক্রান্ত পাতা, ফুল, ফল, শুকনো আক্রান্ত ডালপালা বাগান থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। মুকুল বের হওয়ার সময় বৃষ্টি অথবা ঘন কুয়াশা হলে সতর্কতা মুলক কপার আক্সিক্লোরাইড (যেমন, ব্লাইটক্স) ৩ গ্রাম অথবা কার্বেনডাজিম ও ম্যানকোজেব এর মিশ্র ছত্রাকনাশক (যেমন, সাফ) ২ গ্রাম অথবা ক্লোরোথালোনিল (যেমন, কবচ) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ১০-১২ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

ফলের গুটি ধরার সময় রোগের লক্ষণ দেখা গেলে কার্বেনডাজিম (যেমন, ব্যাভিস্টিন) ১ গ্রাম অথবা থায়োফিনেট মিথাইল (যেমন, টপসিন এম রোকো) ১ গ্রাম প্রতিলিটার জলে আঠা সহ গুলে ১২-১৫ দিন অন্তর ১-২ বার প্রে করতে হবে।

বর্ষায় পাতা, ডগা ঝলসা এবং ডাল শুকনো হয়ে যাওয়া রোদে কপার অক্সিক্লোরাইড ৩-৪ গ্রাম অথবা ক্লোরোথালোনিল ২ গ্রাম অথবা প্রপিনেব (যেমন, অ্যান্ট্রাকল) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে রোদযুক্ত আবহাওয়ায় ১০-১২ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল পাড়ার পরবর্তী সময় পরিণত ফলের উপর এই কালো ক্ষত দাগ কমাতে ফল পাড়ার ১৫-২০ দিন আগে ১ বার কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম অথবা থায়োফেনেট মিথাইল ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে পে করলে এই ক্ষত দাগ অনেকটাই কমে যায়।

তথ্য ঃ সুজিত কুমার রায় ও সুব্রত দত্ত, বি.সি.কে.ভি।

আমের গুচ্ছমুকুল বা ম্যালফরমেসন

রোগটি বেশি বয়সের চেয়ে কম বয়সের গাছেই বেশি দেখা যায়। ডালের ডগায় অথবা ডাল পালার মধ্যবর্তী অংশের অগ্রজ মুকুলগুলি ছোট ছোট, ঘন পাতার গুচ্ছহিসাবে দেখা যায়। এই লক্ষণটি ভেজিটেটিভ ম্যালফরমেসন নামে পরিচিত। সাধারণত আমের নার্শারিতে এই লক্ষণ

আমের গুচ্ছ মুকুল

প্রচুর দেখা যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে পাতার গুচ্ছমুকুল এর চেয়ে পুষ্পমঞ্জরির গুচ্ছমুকুল (ফ্লোরাল ম্যালফরমেসন) বেশি ক্ষতিকারক। আক্রান্ত ফুলগুলি ঠাসাঠাসি ও ঘন সন্নিবেশিত হয়ে লম্বাটে বলাকৃতি ধারন করে। ফুলগুলি ফল ধারনে অক্ষম হয়। পুষ্পদন্ড ও পুষ্পবৃন্তিকা গুলি বেঁটে হয়। সমগ্র মঞ্জরিবিন্যাসটি রোগমুক্ত ও সতেজ মঞ্জরিবিন্যাসের চেয়ে ছোট হয়। সাধারণভাবে পুষ্টিজনিত অভাব, ছত্রাক ও মাকড় জনিত কারণে এই রোগের উৎপত্তির কথা বলা হলেও সঠিক রোগ নির্ণয়ে এখনও গবেষণা চলছে।এ রোগ প্রতিকারে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি দেওয়া হল ঃ

যে সমস্ত বাগানে রোগটির মাত্রা কম সেখানে আক্রান্ত গুচ্ছমুকুল গুলি ভেঙ্গে দিতে হবে।

গাছের কলম করার জন্য আক্রান্ত গাছ থেকে ডগা সংগ্রহ করা যাবে না।

একই গাছ থেকে বেশি মাত্রায় অঙ্গজ মুকুল কলমের জন্য নেওয়া যাবে না।

রোগের মাত্রা বেশি হলে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে এন. এ এ (N A A) ২০০ পি.পি.এম. প্রতি লিটার জলে গুলে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হবে এবং পরবর্ত্তী পর্যায়ে মুকুল বার হওয়ার সময় আক্রান্ত মুকুলগুলি ভেঙ্গে দিতে হবে।

ফুল আসার সময় আক্রান্ত মুকুলগুলি ভেঙ্গে দেবার পর সতর্কতা মূলক মাকড়নাশক (যেমন ইথিয়ন) ১ মিলি ছত্রাকনাশক (যেমন, ব্যাভিস্টিন) ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে একবার স্প্রে করতে হবে।

তথ্য সুত্র - সুজিত কুমার রায় ও সুব্রত দত্ত, বি.সি.কে.ভি.।

● লেবুর আঁচিল বা ক্যাংকার রোগ ঃ

ব্যাকটেরিয়াজনিত এই রোগটি কমলালেবু ছাড়া অন্যান্য গোত্রের লেবুতে দেখা যায়। কিন্তু বেশি মাত্রায় লক্ষ করা যায় কাগজি (অ্যাসিড লাইম) এবং মুসাম্বি (সুইট অরেঞ্জ) গোত্রের লেবুতে।

লেবুর আঁচিল রোগ

রোগটির লক্ষণ পাতা, কচি ডগা, বেশি বয়সের ডালপালা, লেবুর কাঁটা ও ফলে দেখা যায়। রোগের প্রথম অবস্থায় খুব ছোট, গোলাকার, খসখসে হলদে দাগ পাতার নীচের দিকে হয়। রোগের মাত্রা বাড়তে থাকলে পাতার উপরদিকে ধূসর, খসখসে উঁচু আঁচিঁলের মত দাগ লক্ষ করা যায়। দাগটি হলুদ রঙের বৃত্ত দিয়ে ঘিরে থাকে। এই ধরনের আঁচিল ফল, ডালপালা ও লেবুর কাঁটাতেও দেখা যায়। রোগের জীবাণু আক্রান্ত গাছে ৬ মাস বা তারও বেশি সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। যখন আবহাওয়ার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে (৩০-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং জলীয় বাষ্প পাতায় যথেষ্ট পরিমাণ থাকে তখন ব্যাকটেরিয়া প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে এবং গাছের নতুন অংশে বা অন্য রোগমুক্ত গাছে আক্রমণ করে। বৃষ্টি জলের ছিটে এবং এক ধরনের পাতার নালিপোকার মাধ্যমে রোগটি দ্রুত অন্যান্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। রোগের প্রতিকারের জন্য নীচে কয়েকটি সুপারিশ দেওয়া হল।

বাগানের আক্রান্ত ঝরে পড়া পাতা, ফল, পুরনো ডালপালা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

গাছে আক্রান্ত ডাল কচি ডগা, যেখানে ব্যাকটেরিয়া সুপ্ত অবস্থায় থাকে বর্ষার আগেই সেগুলি ছেঁটে ফেলতে হবে এবং স্ট্রেপট্রোসাইক্লিন ১ গ্রাম ও কপার অক্সিক্লোরাইড ১২ গ্রাম ৩ লিটার জলে গুলে গাছে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ডালপালা ছাঁটাই করে গাছের মধ্যে আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছ নির্দিষ্ট দুরত্বে লাগাতে হবে। উপরোক্ত ঔষধের মিশ্রণটি ডালপালা ছাঁটাই এর পর বছরে ২ বার দিলে এ রোগের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। পাতায় নালি পোকার উপদ্রব বেশি থাকলে উপযুক্ত কীটনাশক দিয়ে তা দমন করতে হবে।

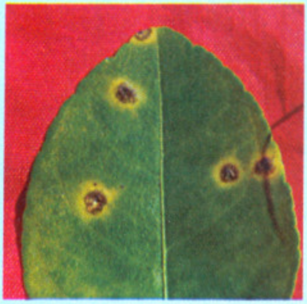
লেবুর পাতায় আঁচিল রোগের লক্ষন

তথ্য ঃ সুজিত কুমার রায় ও সুব্রত দত্ত, বি.সি.কে.ভি।

● লেবুর সাদা গুঁড়োচিতি বা পাউডারি মিলডিউ

সব গোত্রের লেবুতে এই রোগটি দেখা যায়। সাধারণত বসন্ত ও শরৎ ঋতুতে এই রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। গাছের কটি পাতায়, ডগায় এবং খুব কচি ফলের উপর সাদা পাউডারের আস্তরণ ও রোগের প্রধান লক্ষণ। আক্রান্ত পাতার বিকৃতি ঘটে, ছোট হয়ে যায়। সংক্রমণ বেশি হলে পাতা ও কচি ফলগুলি অসময়ে ঝরে যায়। এরোগ নিরাময়ের জন্য সালফার ঘটিত ছত্রানাশক (যেমন সালফেকস) ২.৫ গ্রাম অথবা ট্রায়াডিমেফন (যেমন, বেলেটন) ১ গ্রাম প্রতিলিটারে জলে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

তথ্য ঃ সুজিত কুমার রায় ও সুব্রত দত্ত, বি.সি.কে.ভি।

লেবুর সাদা গুঁড়োচিতি রোগ

বোরণ পুষ্টির কমবেশিতে ফসলের নানা ব্যাধি

বোরণ ফসলের অন্যতম প্রয়োজনীয় পুষ্টিমৌল। মাটি থেকে সামান্য পরিমানেই নেয় গাছ। না হলে চলে না। অভাবে ফসলের নানা স্বাস্থ্যসমস্যা। ফুলকপির বাদামিছোপ, সেলেরির কান্ড ফাটা, আপেলের কর্কশাঁস, বীটের ভিতর পচা বা তামাকের ডগাশুকানো।

● **অভাবের লক্ষণ ঃ** ফসলের শরীরের ভিতরে ক্যাম্বিয়াম সহ ভাজককলা নষ্ট হয়। পারেনকাইমা কোষেরও দেওয়াল নষ্ট, বাহককলা বা ফ্লোয়েম ও জাইলেম গড়ে না ওঠা। পাতলা আবরণের কোষের দেওয়াল অস্বাভাবিক বাড়ে, বিবর্ণ হয় ও পরে নষ্ট হয়। গমের কিছু ভ্যারাইটির দানা পুষ্ট হয় না। এসবের জন্য ফসল ডগা থেকে শুকিয়ে যায়, বিবর্ণ হয় এবং দৈর্ঘ্যে বাড়েনা. পার্শ্ব মুকুল গজায় না বা গজিয়ে মরে যায়। পাতা মোটা, ভঙ্গুর হয় এবং কুঁচকে ও পাকিয়ে যায়। ঝিমিয়ে পড়া পাতা-ডগাতে ফেকাসে ছোপ ধরে, বোঁটা ও কান্ড মোটা হয়। শুকনো ও খসখসে হয়ে ফাটে। অন্য কিছু অংশে ভিজে ছোপ এবং মৃত শাঁসালো ফল, কন্দ ও শিকড়ে বাদামি পোড়া বা ফাটাফাটা দাগ ধরে বা শুকনো পচন ধরে, অবশ্য সবলক্ষণ একই ফসলে হয় না।

বোরণ বেশি হলেও সমস্যা। ফসলের পাতা - ডগা শুকিয়ে মরে যায়। পাতার ডগা আর কিনারাতে প্রথম হয়। মরা অংশের চারপাশ হলদে বর্ডারে ঘেরা। হলুদ অংশটা পাতার শিরার মাঝের অঞ্চল দিয়ে মধ্যশিরার দিকে এগিয়ে যায়।পরে পুরো পাতাটা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে।

- **বোরণের অভাব সৃষ্টি হয় কিভাবে ঃ**

মাটির অন্য প্রধান পুষ্টিমৌলের পরিমাণের সঙ্গে বোরণের সম্পর্ক আছে। নাইট্রোজেনের অভাব থাকলে বোরণ কম লাগে। কম ফসফরাস থাকলে বোরণ লাগে বেশি। ক্যালসিয়ামের অভাবেও বেশি বোরণ সয় না। বেশি ক্যালসিয়ামে বোরণের চাহিদা বাড়ে। পটাশিয়ামের সঙ্গেও বোরণের সম্পর্ক ফসলের শরীরে যেখানে শর্করা তৈরি হয় সেখানে বেশি শর্করা তৈরিতে বোরণ বাধাদেয়। তাতে ফসলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়।

- **বোরণ পুষ্টি (সার) জোগানো ঃ**

মাটিতে বোরণ দেওয়া যায়। যে মাটির ফসলে অভাব দেখা গেছে সেখানে একরে ৭ কেজি বোরাক্স বা সোহাগা। গুঁড়ো করে প্রথমে গরমজলে গুলে পরে বাকী জল মিশিয়ে স্প্রেও করা যায়। লিটারে ৩ গ্রাম হিসাবে। সব চারা লাগানোর ১ মাস ও ২ মাস পরে মোট দু বার।

সূত্র ঃ **ড অসিত মুখোপাধ্যায়,**বিসিকেভি।

ফসলের ডাক্তারি

শিবদাসপুর, চারাপোলের কলাচাষী জায়ন্ট গভর্নর চাষ করেছেন। মোচা ভেঙ্গে নেবার পর সেখান থেকে কালো হয়ে দন্ড বা থোড়টা পচতে আরম্ভ করছে। কাঁদি অপুষ্ট অবস্থাতে পেকে যাচ্ছে শেষমেশ ফলন নেই। ডায়থেন, ফুরাডন এসব দিয়েও কিছু হচ্ছেনা। মোচা কাটার আগে একটু স্ট্রেপটোসাইক্লিন শুধুমোচা আর কলার কাঁদিতে স্প্রে করতে বলা হল। আর মোচা ভাঙ্গার পর জায়গাটা ব্লিচিং গোলা জলে ধুয়ে নিতে বলা হয়। এক সপ্তাহ পরে চাষী হাসিমুখে কথা বলে গেল।

কলাতে একটা ব্যাক্টিরিয়া আরউইনিয়া লাগে। কান্ড এবং গোড়া পচিয়ে ঘা এর সৃস্টি করে। গাছের গায়ে ব্যাক্টিরিয়াটি এমনিই বাস করে। কোন ক্ষত পেলে ঢুকে পচন ঘটায়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যাক্টিরিয়াটির কারণেই থোড় পচেছিল। এই ব্যাক্টিরিয়াটি কলার মোকো(ঢলা) রোগের ব্যাক্টিরিয়া থেকে আলাদা।

সুরক্ষার ওষুধ তৈরি করে নেওয়া

- **বোর্দো মিশ্রণের প্রস্তুত প্রণালী** ঃ- গাছের পাতার উপর তুঁতের বিষক্রিয়া কমানোর জন্য তুঁতের দ্রবণের সাথে কলিচুন মিশিয়ে একে প্রশমিত করা হয়। তুঁতে ও চুনের এইরূপ জলীয় মিশ্রণকে বর্দোমিশ্রণ বলা হয়। আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর পূর্বে প্রথম বর্দো মিশ্রণ তৈরী করেন বিজ্ঞানী পি.এম.এ. মিলারডেট এবং আজ পর্যন্ত এই বর্দো মিশ্রণ বিভিন্ন ফসল, শাক সবজি ও ফল ফুলের বিভিন্ন ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগের প্রতিকার ব্যবস্থা হিসাবে সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১০০ গ্রাম তুঁতেকে ভালো ভাবে গুঁড়ো করে ৫ লিটার জলের সঙ্গে কাঠ বা সিমেন্টের বা প্লাস্টিকের পাত্রের মধ্যে মেশানো হয় এবং অপর একটি সিমেন্টের বা প্লাস্টিকের পাত্রের মধ্যে ১০০ গ্রাম চূনকে ভালোভাবে গুঁড়ো করে ৫ লিটার জলের সঙ্গে মেশানো হয় ও তা

ছেঁকে নেওয়া হয়। এর পর তৃতীয় একটি মাটি বা সিমেন্টের বা প্লাস্টিকের পাত্রের মধ্যে তুঁতের ও চূনের মিশ্রণ মিশিয়ে বর্দো মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণে একটি চকচকে লোহার পাত ধরলে যদি ঐ পাতের উপর মরিচা পড়ার মত তামা জমে, তাহলে ঐ বর্দো মিশ্রনে আরও কিছু পরিমান চুন মেশাতে হবে এবং ছেঁকে নেওয়ার পর ঐ, বর্দো মিশ্রণ ফসলে স্প্রে করার জন্য ব্যবহার করা যাবে। এই বর্দো মিশ্রণ আলুর নাবি ধ্বসা, ও জলদি ধ্বসা পটলের হাজা ও ফলপচা, লঙ্কার ডাঁটাপচা, আঙুরের ডাউনি মিলডিউ, বাদামের টিক্কা, ও লেবুর ফলের কালো ক্ষত রোগে ব্যবহার করা যায়।

সূত্র. ডঃ সুব্রত দত্ত ও ডঃ সুজিত রায়, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

● কেরোসিনের ইমালসান

বাড়িতে মেঝেতে বা কাঠের খুঁটির গোড়ায় সরাসরি কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে বা জলে মিশিয়ে মেঝে মুছলে নানা ধরনের পোকার হাত থেকে কিছু কাল বাঁচা যায়। কিন্তু ফসলের বেলায় কিছু প্রক্রিয়াকরণ দরকার হয় কারণ কেরোসিন তেল ফসলের পাতা ঝলসে দেয়। এই প্রক্রিয়াকরণ হল ইমালসান তৈরী করা। এক লিটার জলে পঁচিশ গ্রাম নরম সাবানের টুকরো ছোট ছোট টুকরো জলে দিয়ে গরম করে সাবান গুলে নিতে হবে। সাবান গোলা ঠান্ডা হলে দুই লিটার কেরোসিন ধীরে ধীরে ঐ গোলায় ঢালতে হবে। ঢালার সময় ক্রমাগত কাঠি দিয়ে নেড়ে যেতে হবে। ঐ সাবান গোলা জল সাদাটে মলমের মতো হয়ে যাবে সবটা কেরোসিন শেষ হলে। এটিই হল কেরোসিনের ইমালসান। এটা দশ বারোগুণ জলে মিশিয়ে স্প্রে করলে কীটশত্রু বেশ খানিকটাই দমন হবে।

Registered under W.B. Act XXVI of 19
Registration No. S/1L37974/2006-07,Kolk

আপনি কি :

- ফসলের কোনো নতুন সমস্যা দেখছেন ?
- কোনো রোগ - পোকা কি অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে ?
- ফলন কি কম হচ্ছে ?
- অন্য কোন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ?
- শস্য সুরক্ষায় নতুন কোনো তথ্য চান ?

তা'হলে এ এ পি পি র সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

-: যোগাযোগের সময় :-

ফোনে প্রতি রবিবার সকাল ১০:৩০ থেকে ১১:৩০ মি: পর্যন্ত
(ড. শ্রীকান্ত দাস ০৯৪৩৩২৮৫১১৫,
ড. মতিয়ার রহমান খান ০৯৪৩৩৩৬২২৯৩)

অথবা

সমাধানের জন্য, চিঠি লিখে বা নিজে এসে যোগাযোগ করুন
প্রতি শুক্রবার সকাল ১১: ০০ থেকে ১২: ৩০ এর মধ্যে
(ছুটির দিন বাদে)

ঠিকানা : ড. শান্তনু ঝা, সচিব, এ এ পি পি,
প্লান্ট প্রোটেকশন ইউনিট, বি সি কে ভি,
মোহনপুর, নদীয়া ৭৪১২৫২
দুরভাষ: ০৯৪৩৩০১১৫২৯
ফ্যাক্স: ০৩৩-২৫৮২৮৬৩০